জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও

United Nations

الأمم المتحدة

Nations Unies

联合国

Naciones Unidas

Организация Объединенных Наций

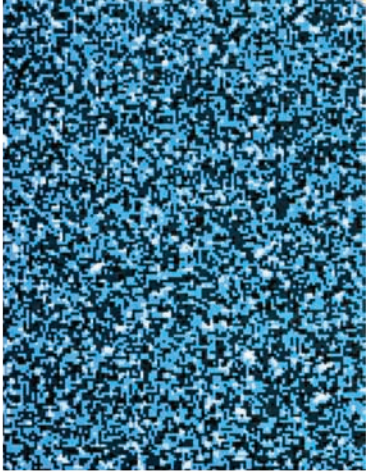

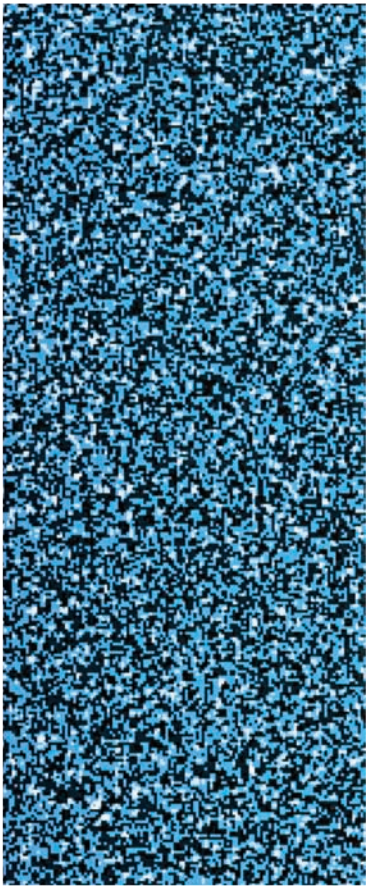

জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও

জাতিসংঘ

[ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

Bengali version of
Everything you always wanted to know about the United Nations
DPI/1888

Published by
United Nations Information Centre, Dhaka
IDB Bhaban
Sher-e-Banglanagar
Dhaka, Bangladesh

Editorial Adviser
Dr. Nurul Momen

Executive Editor
Kazi Ali Reza
unic/pub/2015/02-2500

Current Edition Edited by
M. Moniruzzaman

Printed by : **Print Touch**

জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও (বাংলা রূপান্তর)
ডিপিআই/১৮৮৮

প্রকাশক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
আইডিবি ভবন, শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা, বাংলাদেশ

সম্পাদনা উপদেষ্টা
ড. নূরুল মোমেন

নির্বাহী সম্পাদক
কাজী আলী রেজা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০১
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৭, নভেম্বর ২০১১
সংশোধিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৫, অক্টোবর ২০১৬
সংশোধিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮, মে ২০১৯, অক্টোবর ২০১৯

চলতি সংস্করণ সম্পাদনায়
মো. মনিরুজ্জামান

ইউনিক/প্রকাশ/২০১৯/০৩-৫০০০

স্বল্প পরিসরে ও সহজ ভাষায় অনূদিত এই পুস্তিকাটিতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শুধু একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা নয়, জাতিসংঘ পরিবারের কার কী কাজ, শান্তি ও অগ্রগতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা কী এবং বারবার ফিরে আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরসহ নানাবিধ তথ্য সংবলিত আলোচনা এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।

প্রধানত ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রচিত এই সহজপাঠ দশমবারের মতো মুদ্রিত হলো। বাংলা ভাষার পাঠকবৃন্দের, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের কোনো উপকারে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৯

১
জাতিসংঘ

সূ চ না

১. জাতিসংঘ কী?

জাতিসংঘ হলো স্বাধীন দেশসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন যেখানে এরা বিশ্বশান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যোগদান করেছে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে এর আবির্ভাব। অধুনা এর সদস্যসংখ্যা ১৯৩-তে উন্নীত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো দেশই জাতিসংঘকে ত্যাগ করেনি। ইন্দোনেশিয়া প্রতিবেশী মালয়েশিয়ার সাথে কোন্দলের প্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালে সাময়িকভাবে জাতিসংঘ ত্যাগ করলেও পরের বছরই প্রত্যাবর্তন করে।

২. জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সরকারের মতো নয় কি?

ভুল। সরকারগুলো রাষ্ট্র এবং জনগণের প্রতিনিধি। আর জাতিসংঘ কোনো বিশেষ সরকার বা কোনো একক জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। এটি সার্বভৌম দেশগুলোর একটি সমিতির মতো যা কেবল সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এটি একটা বৈশ্বিক ফোরামের মতো, যেখানে স্বাধীন দেশগুলো বিশ্বের সমস্যাগুলো, যা তাদেরকে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রভাবিত করে, তা আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্র হয়।

৩. জাতিসংঘকে তার কার্যসম্পাদনে নির্দেশনাদানকারী কোনো অনুশাসন ও বিধানাবলি আছে কি?

হ্যাঁ, তা হলো জাতিসংঘ সনদ। এটা হলো একটি নির্দেশিকাবলি, যা সদস্যদেশের অধিকার ও দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে করণীয় কার্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। একটি জাতি জাতিসংঘের সদস্য হওয়া মাত্র এটি জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও অনুশাসন মেনে নেয়। সানফ্রানসিসকোতে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড তার যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার গঠনে বিলম্বের কারণে পরে স্বাক্ষর করে এবং জাতিসংঘের ৫১তম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়।

স্বাগতিক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ ন্যাশনাল আর্কাইভে রক্ষিত জাতিসংঘ সনদের মূল কপি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সনদের হুবহু প্রতিলিপি প্রদর্শনের নিমিত্তে রাখা হয়।

৪. জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

জাতিসংঘের চারটি মূল উদ্দেশ্য আছে :

- ☐ বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষা করা।
- ☐ জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।
- ☐ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা, ক্ষুধা-রোগ-ব্যাধি ও অশিক্ষাকে জয় করা এবং পারস্পরিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করতে এক সাথে কাজ করা।
- ☐ জাতিসমূহকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাকল্পে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করা।

(১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহর দেখতে এ রকমই ছিল। যুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।)

(১৪ আগস্ট ১৯৪১ সাল। প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল সমুদ্রে কোনো এক স্থানে এইচ এম এস প্রিন্স অব ওয়েলস্ জাহাজে মিলিত হয়েছেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ছিল জাতিসংঘ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ।)

৫. জাতিসংঘের কিভাবে সূচনা হলো?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) এক বেদনাবিধুর সময়কালে জাতিসংঘের ধারণা জন্মলাভ করে। লাখ লাখ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আরো লাখ লাখ হয় আশ্রয়হারা। নগরীগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুদ্ধ থামাতে যেসব বিশ্ব নেতৃত্ব একজোট হন তাঁরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বন্ধের অনুকূল একটি পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে অনুভব করেন। তাঁরা অনুধাবন করেন যে, এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন সকল জাতি একটি বিশ্ব সংগঠনের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। জাতিসংঘই ছিল সেই ভাবী সংগঠন।

জাতিসংঘ রাতারাতি তৈরি হয়নি। বহু বছরের পরিকল্পনার পরই সংগঠনটির অস্তিত্ব লাভ করে। এটা ঘটেছে এভাবে :

- ☐ ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট আটলান্টিক মহাসাগরে এক রণতরীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট** এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী **উইন্সটন চার্চিল** এক গোপন বৈঠকে যোগদান শেষে বিশ্ব শান্তির নিমিত্তে একটি পরিকল্পনার ঘোষণা দেন। তারা এই পরিকল্পনাকে আটলান্টিক সনদ হিসেবে আখ্যা দেন।
- ☐ ১৯৪২ সালের পহেলা জানুয়ারি ছাব্বিশটি দেশের প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটন ডিসিতে মিলিত হয়ে **জাতিসংঘ ঘোষণায়** স্বাক্ষর করেন। তাঁরা যুদ্ধ বন্ধের শপথ গ্রহণ করেন এবং আটলান্টিক সনদ মেনে নেন।
- ☐ ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মস্কোতে মিলিত হন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী

ইয়াল্টা, ইউএসএসআর। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ সাল। জোসেফ স্ট্যালিন (বাঁ থেকে দ্বিতীয়), ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট (ডানে কথা বলছেন) এবং উইন্সটন চার্চিল ইয়াল্টা সম্মেলনে পরামর্শ করছেন। এই তিন নেতা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় এক সাথে কাজ করতে সম্মত হন।)

শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসমূহের একটি সংগঠনের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছান। এই চুক্তিনামা **মস্কো ঘোষণা** নামে পরিচিত।

□ ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরতে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই সম্মেলনকে প্রায়ই **ডাম্বারটন ওক্স সম্মেলন** বলে আখ্যায়িত করা হয়; এর কারণ যেখানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ডাম্বারটন ওক্স।

লেক সাকসেস, নিউইয়র্ক, নভেম্বর ১৯৪৯ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিসেস এলেনার রুজভেল্ট সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সম্পর্কিত একটি পোস্টার ধরে আছেন।

□ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টাতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা নিরাপত্তা পরিষদে ভোট গ্রহণ পদ্ধতির ব্যাপারে সম্মত হন। তাঁরা সানফ্রানসিসকোতে একটি সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

□ ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুনব্যাপী অনুষ্ঠিত **সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে** যোগদান করেন। খসড়া করার পর ২৬ জুন তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সনদ এবং নব্য আন্তর্জাতিক আদালতে আইনকানুন অনুমোদন করেন।

□ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন করে

এবং একে স্বীকৃতি প্রদান করে। আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হয় জাতিসংঘের। সেজন্য ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের জন্মদিনকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

৬. 'জাতিসংঘ' নামটি কোথা থেকে এল?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘ নামটি প্রস্তাব করেন। ১৯৪২ সালে যখন ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘের তরফ থেকে ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদান করেন, এই নামটি তখনই প্রথম সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়। সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর প্রদত্ত নামটি গ্রহণে সম্মত হন। রুজভেল্ট জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরের কয়েক সপ্তাহ আগে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. এ ধরনের সংগঠন কি ঐ সময়ই প্রথম সৃষ্টি হয়?

না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে **লিগ অব নেশন্‌স** বা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের মতো এরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা।

দুর্ভাগ্যবশত সকল জাতি এই লিগে যোগদান করেনি। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র কখনো এর সদস্য হয়নি। যারা পরে যোগদান করেছিল তারা সদস্যপদ প্রত্যাহার করেছে অথবা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়নি। নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোনো ক্ষমতা লিগের ছিল না। লিগের ব্যর্থতা বিরোধের গতিকে ত্বরান্বিত করে, পরিণাম দাঁড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। লিগ নিজস্বভাবে ব্যর্থ হলেও এটি একটি বৈশ্বিক সংগঠনের স্বপ্নের সূচনা করে, যার ফলে জাতিসংঘের আবির্ভাব ঘটে।

৮. জাতিসংঘ সদর দপ্তর কোথায়?

জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের প্রথম সভায় এই মর্মে গৃহীত হয় যে, সংগঠনটির স্থায়ী সদর দপ্তর হবে যুক্তরাষ্ট্রে। যে চারটি অট্টালিকা নিয়ে বর্তমানে জাতিসংঘ সদর দপ্তর, সেগুলো হলো নিচু গম্বুজবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ ভবন,

৩৯তলা কাচ ও মার্বেলের তৈরি সেক্রেটারিয়েট টাওয়ার, নদী বরাবর নিচু চারকোণা সম্মেলন কক্ষ এবং জায়গাটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরি।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ভূমি ও অট্টালিকা একটি আন্তর্জাতিক এলাকা। এর অর্থ হলো, জাতিসংঘের নিজস্ব পতাকা আছে, আছে নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মকর্তা যাঁরা এলাকাটির নিরাপত্তা বিধান করেন এবং এই সংগঠন নিজস্ব ডাকটিকিট ব্যবহার করে।

৯. জাতিসংঘের গঠনপ্রণালী কী রূপ?

প্রায় সমগ্র বিশ্বে জাতিসংঘ কাজকর্ম পরিচালিত হয় এবং ছয়টি প্রধান অঙ্গসংস্থা এই দায়িত্ব সম্পাদন করে।

এগুলো হলো :

- ☐ সাধারণ পরিষদ
- ☐ নিরাপত্তা পরিষদ
- ☐ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- ☐ অছি পরিষদ
- ☐ আন্তর্জাতিক আদালত
- ☐ সচিবালয়

এই অঙ্গসমূহ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অবস্থিত। কেবল ব্যতিক্রম আন্তর্জাতিক আদালত। নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে এই আদালত অবস্থিত।

জাতিসংঘের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ১৪টি সংগঠন **বিশেষায়িত সংগঠন** হিসেবে পরিচিত। তারা স্বাস্থ্য, কৃষি, ডাক বিভাগ সম্পর্কিত এবং আবহাওয়ার মতো বিবিধ ক্ষেত্রে কাজ করে। অধিকন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে আরো ৩৫টি **কর্মসূচি, তহবিল ও বিশেষ সংগঠন** কাজ করছে। এই সংগঠনসমূহ এবং জাতিসংঘের মূল ও বিশিষ্ট কর্মসূচিসমূহ মিলেই জাতিসংঘ ব্যবস্থা।

১০. কিভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ করা হয়? তাঁর ভূমিকা কী?

জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করেন। জাতিসংঘ গঠন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত নয়জন মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছেন :

- ট্রিগভি লাই (নরওয়ে) ১৯৪৬-১৯৫২
- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন) ১৯৫৩-১৯৬১
- উ থান্ট (বার্মা, বর্তমানে মিয়ানমার) ১৯৬১-১৯৭১
- কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (অস্ট্রিয়া) ১৯৭২-১৯৮১
- হ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার (পেরু) ১৯৮২-১৯৯১
- বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি (মিসর) ১৯৯২-১৯৯৬
- কফি আনান (ঘানা) ১৯৯৭-২০০৬
- বান কি-মুন (দক্ষিণ কোরিয়া) ২০০৭-২০১৬
- এন্তোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল) ২০১৭-

কোনো লিখিত নিয়মবিধি না থাকলেও জাতিসংঘ মহাসচিবের পদটি বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসছে। গত ৫৬ বছরে এই ব্যাপারটি ঘটেছে। উদাহরণত বার্মার উ থান্ট (এশিয়া)-এর পরবর্তী একজন পশ্চিম ইউরোপীয় অস্ট্রিয়ার অধিবাসী কুর্ট ওয়াল্ডহেইম মহাসচিব নির্বাচিত হন। তারপর আসেন পেরুর অধিবাসী হ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার (লাতিন আমেরিকা)। প্রত্যেকে দু'বার পাঁচ বছর মেয়াদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯২ সালে মিসরের অধিবাসী বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি সংগঠনের ষষ্ঠ মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এক মেয়াদে কর্মরত ছিলেন এবং তারপর ১৯৯৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঘানার অধিবাসী কফি আনান, (আফ্রিকার আরেকটি দেশ)। এই নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে যখন কফি আনানকে দ্বিতীয়বারের মতো মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়।

ট্রিগভি লাই (নরওয়ে)
১৯৪৬-১৯৫২

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন)
১৯৫৩-১৯৬১

উ থান্ট, বার্মা (মিয়ানমার)
১৯৬১-১৯৭১

কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (অস্ট্রিয়া)
১৯৭২-১৯৮১

হ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার (পেরু) ১৯৮২-১৯৯১

বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি (মিসর) ১৯৯২-১৯৯৬

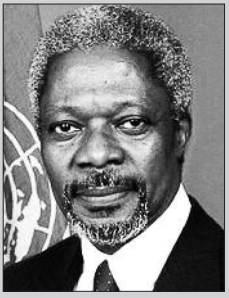

কফি আনান (ঘানা) ১৯৯৭-২০০৬

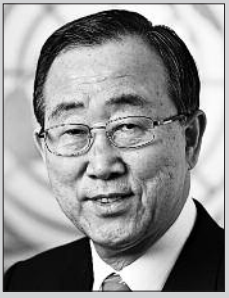

বান কি-মুন (দক্ষিণ কোরিয়া) ২০০৭-২০১৬

মহাসচিব যেকোনো সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন তা বিশ্বশান্তির পক্ষে হুমকিস্বরূপ। তিনি সাধারণ পরিষদ বা জাতিসংঘের অন্য যেকোনো অঙ্গসংস্থা কর্তৃক করতে পারেন। মহাসচিব প্রায়ই সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিবাদের ক্ষেত্রে রেফারির ভূমিকা পালন করেন। ফলত তাঁর হস্তক্ষেপ বা সফল দায়িত্ব পালনের ফলে এরা নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে যাওয়ার আগেই বা সমস্যাগুলো স্পষ্ট বিরোধে রূপ নেয়ার আগেই তা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

১১. জাতিসংঘের কাজের জন্য কে অর্থ প্রদান করে? এবং কী পরিমাণ?

জাতিসংঘের সদস্যরা, ১৯৩ সদস্যের সবই জাতিসংঘের সব কাজের জন্য অর্থ প্রদান করে। এর অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই।

জাতিসংঘে দু'ধরনের বাজেট আছে : **নিয়মিত বাজেটের** আওতায় রয়েছে নিউইয়র্কস্থ সচিবালয়ের প্রধান কার্যাবলি এবং পৃথিবীব্যাপী মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পরিচালনা। **শান্তিরক্ষা বাজেট** বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়ই রাজনৈতিক সমস্যা আক্রান্ত এলাকায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করে।

এই উভয় বাজেটের জন্য চাঁদা দেয়া সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক। সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করে। একটি দেশের চাঁদা দেবার সামর্থ্য, জাতীয় আয় এবং জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এই মাপকাঠি নির্ধারিত হয়।

১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট গিয়ে দাঁড়ায় বার্ষিক ১.৩ বিলিয়ন ডলার। এটি নিউইয়র্ক

এন্তোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল)
২০১৭-

এন্তোনিও গুতেরেস ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি জাতিসংঘের নবম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে গুতেরেস ২০০৫ সালের জুন থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ উদ্বাস্তু-বিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে কাজ করেন।

ইউএনএইচসিআর-এ যোগদানের আগে মি. গুতেরেস সরকারি ও জনসেবামূলক কার্যে ২০ বছরের বেশি সময় ব্যয় করেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব তিমুর সংকট সমাধানে তিনি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

২০০০ সালের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন তিনি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য লিসবন এজেন্ডা গ্রহণে নেতৃত্ব দেন এবং প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়ন-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি পর্তুগিজ স্টেট কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। গুতেরেস ১৯৭৬ সালে পর্তুগিজ সংসদে নির্বাচিত হয়ে ১৭ বছর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গুতেরেস ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কাউন্সিলের সংসদীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি জনতত্ত্ব, অভিবাসন ও উদ্বাস্তু-বিষয়ক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

গুতেরেস বহু বছর সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিশ্বব্যাপী সংগঠন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি এই গ্রুপের সহসভাপতি, আফ্রিকান কমিটি এবং পরে উন্নয়ন কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তিনি ওই দুই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি পর্তুগিজ উদ্বাস্তু পরিষদ ও পর্তুগিজ ভোক্তা সমিতি ডেকো প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭০'র দশকের গোড়ার দিকে লিসবনের পার্শ্ববর্তী দরিদ্র এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনায় নিয়োজিত সেন্ট্রো ডি অ্যাকাও সোশ্যাল ইউনিভার্সিটারিও নামক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গুতেরেস বিশ্বের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব-জোট ক্লাব অব মাদ্রিদের সদস্য ছিলেন।

গুতেরেস ১৯৪৯ সালে লিসবনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্সটিটিউটো সুপিরিয়র টেকনিকো থেকে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

নগরীর বার্ষিক বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশের সমান। ১৯৯৬ সালের শান্তিরক্ষা বাজেটের পরিমাণ ছিল ১.৬ বিলিয়ন ডলার। যুদ্ধের খরচ জোগাতে এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সে বিচারে শান্তিরক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়কে অর্থের সদ্ব্যবহার বলতে

(জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জন্য মনোনীত জায়গার দৃশ্য। ছবিটি ফোর্টি ফার্স্ট স্ট্রিটস্থ টিউটর সিটি থেকে উত্তরে ফোর্টি এইটথ স্ট্রিটের দিকে মুখ করে তোলা।)

হয়। জাতিসংঘ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতেও বার্ষিক ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

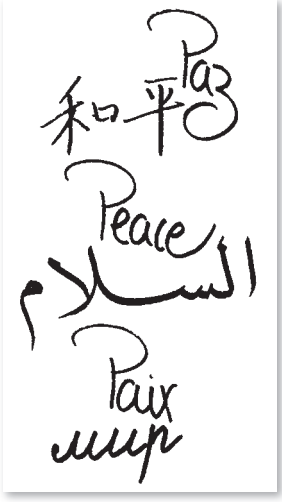

এই উন্নয়ন খাতের আওতায় থাকে ক্ষুধার্তদের জন্য খাদ্যের সংস্থান, শিশুদের দেহে মরণব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা, অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা, জমি সেচ এবং পরিবেশকে আরো বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। এই অর্থ বিবিধ জাতিসংঘ তহবিল এবং কর্মসূচির মাধ্যমে সংগৃহীত এবং ব্যয়িত হয়, যেমন– জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)। সদস্যদেশগুলো এ ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা প্রদান করে। এই অর্থ পৃথিবীর সমগ্র মানুষের মাথাপিছু ৮০ সেন্টের সমতুল্য। অন্যদিকে ১৯৯৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ অস্ত্র খাতে ব্যয় বাবদ প্রায় ৭৭৮ বিলিয়ন ডলার খরচ করে, যা কিনা মাথাপিছু ১৩৪ ডলারের সমান।

১.২ জাতিসংঘে কী কী ভাষা ব্যবহৃত হয়?

জাতিসংঘের সরকারি ভাষা হলো আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসি, রাশিয়ান এবং স্পেনীয়। দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয় ইংরেজি ও ফরাসি।

ত থ্য চি ত্র

কসাইখানা থেকে উত্থিত অট্টালিকা

১৯৪৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সাধারণ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সদর দপ্তর স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু স্থান নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির পছন্দের তালিকায় প্রথমে নিউইয়র্ক ছিল না। ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন ও সানফ্রানসিসকোর মতো নগরীগুলো কমিটির বিবেচনায় ছিল। এমনকি নিউইয়র্ক যখন নির্বাচন করা হয়, কমিটি তখন নগরীর উত্তর দিকের কোনো স্থানের কথা ভেবেছিলেন। ফার্স্ট এভেন্যু নামক স্থানে জায়গা ক্রয় করার জন্য জন ডি রকফেলার জুনিয়রের কাছ থেকে শেষ মুহূর্তে পাওয়া ৮.৫ মিলিয়ন ডলারের অর্থসাহায্যই কমিটিকে বর্তমান স্থান নির্বাচন করতে প্রভাবিত করে। পরে নিউইয়র্ক নগরীর বাড়তি সম্পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

(নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর ভবন, যেখানে আজ এটি দাঁড়িয়ে আছে।)

একজন প্রতিনিধি অফিশিয়াল ভাষাগুলোর যেকোনোটিতে কথা বলতে পারেন এবং সেটা একই সাথে অন্য অফিশিয়াল ভাষাগুলোতে অনূদিত হয়। জাতিসংঘের অধিকাংশ দলিল ছয়টি ভাষার সবগুলোতে প্রকাশিত হয়। কখনো কখনো একজন কূটনীতিক সরকারি ভাষাবহির্ভূত অন্য কোনো ভাষায় তার বক্তব্য প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ অবশ্যই অফিশিয়াল ভাষাগুলোর যেকোনো একটিতে একটি ব্যাখ্যা অথবা তাদের বক্তব্যের একটি লিখিত পাঠ সরবরাহ করবেন।

জাতিসংঘ সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের কাজকর্মের ভাষা হিসেবে ইংরেজি অথবা ফরাসি ব্যবহার করেন। অন্য কথায়, সচিবালয়ে কর্মরত প্রত্যেককে ইংরেজি বা ফরাসি বা উভয় ভাষাতেই দক্ষ হতে হবে।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জন্য যে জায়গাটি নির্বাচন করা হয় তা ছিল কসাইখানা, হালকা শিল্পকারখানা এবং একটি রেলপথ গ্যারেজ মিলে নগরীর এক অবহেলিত জায়গা। একদিকে ফার্স্ট এভেন্যুতে ভারী শব্দে ট্রাক চলাচল করে এবং নগরীর নদীতীরবর্তী অংশের প্রান্তে ইস্ট রিভার

আমেরিকার
প্রেসিডেন্ট বিল
ক্লিনটন
২৩ জানুয়ারি ১৯৯৭

যদি জাতিসংঘ না হয় তবে কে... ...?

বিশ্বের অগ্রগতি এবং শান্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতিসংঘ সচেষ্ট। এটি শিশুদের রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রদান করে, শরণার্থীদের নিরাপদে অবস্থান ও গৃহে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে, কৃষকদেরকে ভালো ফসল ফলাতে শিক্ষা দেয়, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার ঠেকাতে সচেষ্ট থাকে। এঙ্গোলা থেকে মধ্যপ্রাচ্য অবধি জাতিসংঘ কূটনীতিকে কাজে লাগাচ্ছে এবং শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

ড্রাইভ বরাবর সাঁই সাঁই ধেয়ে চলে যানবাহন। ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্টের নামে তখন থেকে ইস্ট রিভার ড্রাইভের নতুন নামকরণ করা হয়েছে FDR ড্রাইভ। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের আকাশচুম্বী অট্টালিকার বদৌলতে জায়গাটির দৃশ্যপট এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

মূলত নকশাকারীগণ ৮৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি ৪৫তলা অট্টালিকা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। মহাসচিব ট্রিগভি লাইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় ২০ মিলিয়ন ডলার কমানো হয় এবং অট্টালিকার আকৃতি কমিয়ে ৩৯তলা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার নির্মাণ খরচ বাবদ ৬৫ মিলিয়ন ডলারের সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে। এই ঋণের সর্বশেষ কিস্তি ১৯৮২ সালে পরিশোধ করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২৪ অক্টোবর মহাসচিব ট্রিগভি লাই সদর দপ্তর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯ মাস পর ১৯৫১ সালের ২১ আগস্ট, সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের নতুন কার্যালয়ে কাজ আরম্ভ করেন।

২

জাতিসংঘ পরিবার

প্রত্যেকে যা করে

জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থার মূল কাজ কী কী?

সনদ জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গ অনুমোদন করে। এই দলিলে তাদের গঠন ও কার্যাবলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

সাধারণ পরিষদ : সাধারণ পরিষদ হলো জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় বিভাগ যেখানে প্রতিটি জাতি নিজেদের ব্যাপারে অবগত হতে পারে। জাতিসংঘের সব সদস্যের এখানে প্রতিনিধিত্ব আছে। ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, ছোট হোক বা বড় হোক, প্রতিটি জাতির আছে একটি করে ভোট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি দেশের একটি করে ভোট থাকলেও একটি প্রতিনিধিদল প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রায়ই কয়েকজন লোকের সমন্বয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। প্রতিনিধিদলের প্রধান থাকেন সাধারণত রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের একজন কূটনীতিক।

সাধারণ পরিষদ বছরে একবার সভায় মিলিত হয়। সেপ্টেম্বরের কোনো এক দিন এই সভা শুরু হয় এবং কমপক্ষে তিন মাসব্যাপী চলে। বছরের অন্যান্য সময়ে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে এবং যেকোনো সময় জরুরি সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

পরিষদ প্রতি বছর একজন সভাপতি নির্বাচিত করে যার কাজ হলো সভায় সভাপতিত্ব করা, অর্থাৎ পরিষদের সভা চালানো।

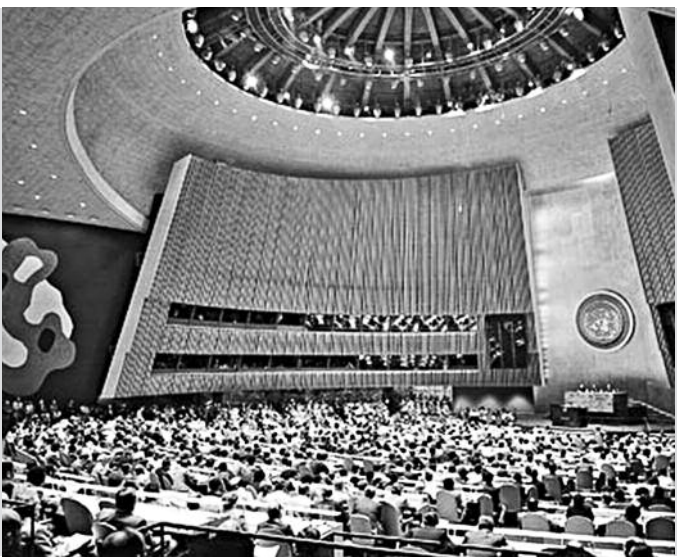

সাধারণ পরিষদ : সম্মেলন কক্ষ, যেখানে ১৮৯ জন প্রতিনিধি মিলিত হন। ১৯৫২ সালে পরিষদের সপ্তম নিয়মিত অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে পরিষদ প্রথম এই হলে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদে চীন ও পালাউয়ের প্রতিনিধি

তথ্যচিত্র

এক দেশ একটি ভোট

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সব জাতির ক্ষেত্রেই এই বিধি প্রযোজ্য। চীনের জনসংখ্যা এক বিলিয়নের ওপর। এর একটি ভোট। টুভালু, ১০,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সদস্য। এরও একটি ভোট রয়েছে।

সাধারণ পরিষদ যেকোনো বিষয়ে আলোচনা বা সুপারিশ করতে পারে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনাধীন বিষয়গুলো ছাড়া। সামরিক সংঘাত, শান্তিরক্ষা এবং নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো প্রায়ই আলোচিত হয়। শিশু, যুবসমাজ ও নারীদের অবস্থা উন্নয়নের পথ ও পন্থা নিয়েও পরিষদ আলোচনা করে। টেকসই উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোও এর আলোচনার অন্তর্গত। অধিকন্তু পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ এবং মহাসচিবের তরফ থেকে প্রতিবেদন পেয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে এটি নতুন সদস্য অনুমোদন করে। এই পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ করে থাকে।

অন্যান্য অঙ্গসংস্থার সদস্যদের নির্বাচিত করে এই পরিষদ। প্রতিটি সদস্যদেশ কী পরিমাণ চাঁদা দেবে এবং সে অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে সে সিদ্ধান্ত নেয় সাধারণ পরিষদ।

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সদস্যদেশগুলোর কাছে কেবল সুপারিশরূপে উত্থাপিত হয়। তবু এই সুপারিশগুলোর গুরুত্ব অনেক। কারণ সাধারণ পরিষদ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশ্ব জনমতকে তুলে ধরে।

নিরাপত্তা পরিষদ : নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্বশান্তির প্রধান রক্ষাকারী হিসেবে গঠন করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদ যেখানে পৃথিবীর যেকোনো বিষয় আলোচনা করে, সেখানে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষেত্র হলো শান্তি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমস্যা।

জাতিসংঘের সব সদস্যদেশই নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করতে রাজি হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদ : নরওয়ের উপহার এই পরিষদ কক্ষের নকশা করেন নরওয়ের শিল্পী আনস্টেইন আর্নবার্গ। নরওয়ের শিল্পী পার ক্রোগের আঁকা বিশাল দেয়ালচিত্রটি পূর্ব দিকের দেয়ালের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে; এটি ভবিষ্যৎ শান্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার শপথকে প্রতীক রূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

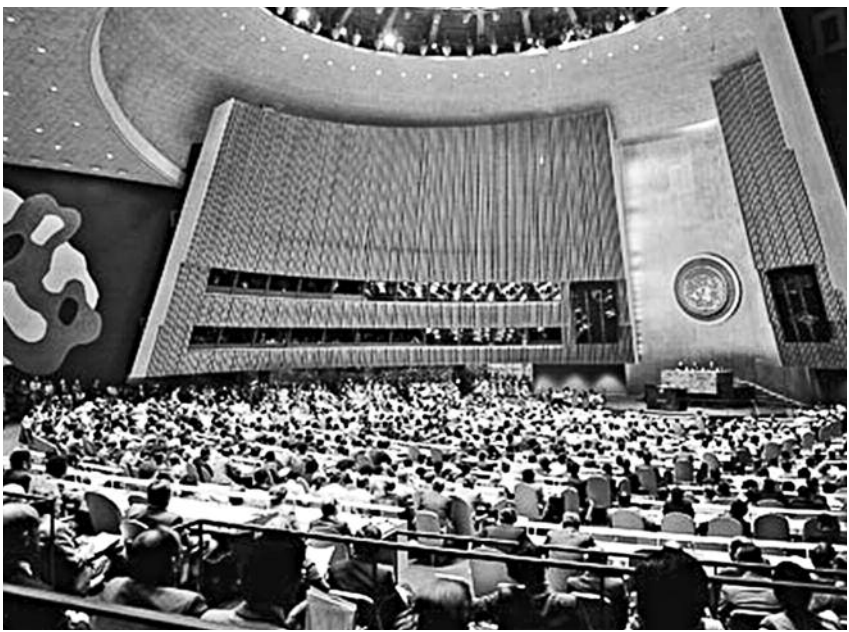

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৫। এর মধ্যে পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য। সেগুলো হলো : চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। অন্য দশটি সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের আলোকে দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

সাধারণ পরিষদের মতো নিরাপত্তা পরিষদ নিয়মিত সভায় মিলিত হয় না। বরং যেকোনো সময় স্বল্প সময়ের ঘোষণায় সভা আহ্বান করা যেতে পারে। জাতিসংঘের সদস্য হোক বা না হোক যেকোনো দেশ অথবা মহাসচিব কোনো বিরোধ বা শান্তির জন্য হুমকি এমন কোনো বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারেন। সদস্যরা পালাক্রমে এককালীন এক মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁরা তাঁদের দেশের নামগুলোর ইংরেজি বর্ণমালার ধারানুক্রমে নির্বাচিত হন।

নিরাপত্তা পরিষদের ভোট-প্রথা সাধারণ পরিষদ থেকে ভিন্ন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করাতে হলে নয়টি সদস্যের 'হ্যাঁ'-সূচক ভোট প্রদান আবশ্যক, কিন্তু স্থায়ী পাঁচ সদস্যের কেউ যদি 'না' ভোট প্রদান করে, তবে সেটা হবে ভেটো এবং সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবে না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : সংক্ষেপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে ECOSOC বলা হয়। এই পরিষদ অর্থনৈতিক সমস্যাবলি, যেমন– ব্যবসা, পরিবহন, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা, যেমন– জনসংখ্যা, শিশু, বাসস্থান, নারী অধিকার, জাতিগত বৈষম্য, মাদকদ্রব্য, অপরাধ, সমাজকল্যাণ, যুবসমাজ, মানব পরিবেশ, খাদ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। সব স্থানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন এবং মানবাধিকার ও জনগণের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানো ও তা বাস্তবায়নের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ করাও এই পরিষদের দায়িত্ব।

ECOSOC-এ ৫৪টি সদস্যদেশ রয়েছে। সব সদস্য তিন বছর মেয়াদে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণত বছরে একবার অধিবেশনে বসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এর সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : সুইডেনের উপহার। এই পরিষদের কক্ষের নকশা করেন সুইডেনের শিল্পী সেন মার্কেলিয়াস।

ECOSOC-এর কাজের ব্যাপকতা এত বেশি যে একটি একক সংগঠনের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সে জন্য একে সহায়তা করতে অনেকগুলো কমিশন কাজ করে।

এর মধ্যে বেশ কিছু কার্যকরী কমিশন হিসেবে পরিচিত এবং এরা ECOSOC-এর নির্দিষ্ট বিষয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। সেগুলো হলো :

- ☐ মানবাধিকার কমিশন
- ☐ মাদকদ্রব্য কমিশন
- ☐ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন
- ☐ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কমিশন
- ☐ পরিসংখ্যান কমিশন
- ☐ অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধের বিচার-সংক্রান্ত কমিশন
- ☐ টেকসই ও স্থায়ী উন্নয়ন-সংক্রান্ত কমিশন

অন্যগুলো হলো আঞ্চলিক কমিশন যারা বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার বিশেষ সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে। এগুলো হলো :

ECA-আফ্রিকান অর্থনৈতিক কমিশন ● ECE-ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন ● ECLAC–লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় অর্থনৈতিক কমিশন ● ESCAP–এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন ● ESCWA–পশ্চিম এশীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন।

ECOSOC-কেবল কার্যকরী ও আঞ্চলিক কমিশনগুলোর ওপরই নির্ভর করে না। এটি বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এবং জাতিসংঘ কর্মসূচির মাধ্যমেও এর কর্মকাণ্ড চালায়। প্রায়ই নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা একত্রে কাজ করে।

জাতিসংঘে ১৪টি বিশেষায়িত সংস্থা আছে। প্রতিটি তাদের নিজস্ব সদস্য, বাজেট এবং সদর দপ্তর নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র সংগঠন। তারা সমস্যা বিচার বিশ্লেষণ করে পরামর্শ প্রদান করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তা প্রদান করে। এগুলো হলো :

ILO–আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ● FAO–জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ● UNESCO–জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংগঠন ● WHO–বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ● IBRD–বিশ্ব ব্যাংক ● IMF–আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ● ICAO–আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিমান চলাচল সংস্থা ● UPU–বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন ● ITU–আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন ● WMO–আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা ● IMO– আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা ● WIPO–বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পদ সংস্থা ● IFAD–আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল ● UNIDO–আন্তর্জাতিক শিল্প উন্নয়ন সংস্থা।

একই ধরনের কিন্তু স্বতন্ত্র আরো দুটি সংস্থা হলো :

- IAE–আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা
- WTO–বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

অছি পরিষদ : পরিষদ কক্ষটি সজ্জিত করেছে ডেনমার্ক এবং এর নকশা করেছেন ডেনিশ শিল্পী ফিন জুল। এক দেয়ালে একটি হাত উত্তোলনরত নয় ফুট উঁচু একটি নারী মূর্তি রয়েছে। সেগুন কাঠের ওপর খোদাই করা এই মূর্তিটির স্রষ্টা একজন ডেনিশ শিল্পী হিনরিক স্টার্ক।

নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ করার জন্য সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। এগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন দাখিল করে। কর্মসূচিগুলো হলো :

UNICEF–জাতিসংঘ শিশু তহবিল ● UNRWA–নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্মসংস্থা ● UNHCR–শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনারের কার্যালয় ● WFP-বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ● UNITAR–জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ● UNCTAD–জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলন ● UNDP–জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ● UNFPA–জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ● UNEP–জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ● UNU–জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় ● UN-WOMEN–জাতিসংঘ লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সত্তা UNHSP (UN-Habitat)–জাতিসংঘ জনবসতি কর্মসূচি।

অছি পরিষদ

জাতিসংঘ যখন কাজ শুরু করে তখন পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলের জনগণ স্বাধীন ছিল না। তাদের কতক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রণীত ম্যান্ডেট ব্যবস্থার আওতাধীন ছিল।

অন্যগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শত্রুরাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলগুলো এক বিশেষ নিরাপত্তায় আনা হয় এবং তখন এগুলোকে বলা হয় অছি অঞ্চল। অছি অঞ্চলভুক্ত জনগণের সামাজিক অগ্রগতি তদারকির জন্য জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা হিসেবে অছি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোড়ার দিকে এ ধরনের ১১টি অঞ্চল ছিল, যার অধিকাংশই আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত।

নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য–অর্থাৎ চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

অছি পরিষদ সাধারণত বছরে একবার মে ও জুন মাসে সভায় মিলিত হয়। এই পরিষদ অছি অঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসমূহের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিচার-বিশ্লেষণ করে; অছি অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে কি না অথবা অঞ্চলভুক্ত জনগণ নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে পারছে কি না তা পরীক্ষা করে এই পরিষদ। এ ছাড়া এই পরিষদ অছি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্তসাপেক্ষে সেখানে কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা অবগত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ অছিভুক্ত অঞ্চল পালাউ, যা আগে জাতিসংঘের শাসনাধীনে ছিল, স্বাধীনতা অর্জন করায় প্রায় অর্ধশত বছর পর অছি পরিষদ তার কাজ স্থগিত করে। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবেই কেবল এই পরিষদ সভায় মিলিত হবে।

জাতিসংঘ স্বায়ত্তশাসনবিহীন এলাকার জনগণের জন্যও কাজ করে থাকে। এই অঞ্চলগুলো, যা প্রায়ই উপনিবেশ নামে পরিচিত, একটি রাষ্ট্র কর্তৃক শাসিত হয় এবং সে রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

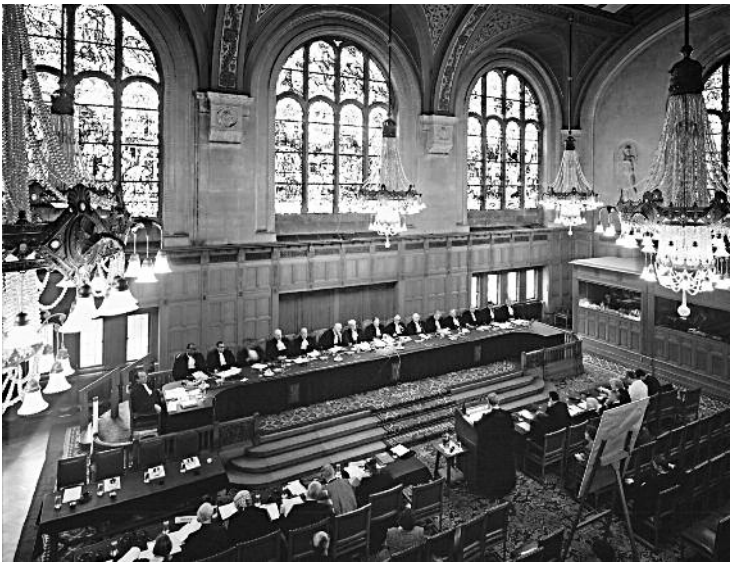

নেদারল্যান্ডের দি হেগ নগরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালত

নিয়ে থাকে। অছি পরিষদ কেবল অছিভুক্ত অঞ্চলগুলো তদারক করায় ১৯৬০ সালে সাধারণ পরিষদ এক ঘোষণায় সকল উপনিবেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা ব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। যেসব দেশ এই উপনিবেশগুলো শাসন করে তারা সেখানে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে উপনিবেশ উৎখাতের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করে। এই ঘোষণার পর ৭০টির মতো উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং এরা সবাই জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক আদালত আইনগত বিচারকাজ সম্পাদনের ব্যাপারে জাতিসংঘের একটি মুখ্য অঙ্গ। কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, কেবল রাষ্ট্রই এই আদালতে মামলা করতে পারে। কোনো দেশ একবার আদালতে

মামলা চালাতে রাজি হলে তাকে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার শপথ নিতে হবে। অধিকন্তু জাতিসংঘের অন্য অঙ্গগুলো আদালতের কাছে উপদেশমূলক মতামত চাইতে পারে।

আদালত অনেক বিরোধ মীমাংসায় সহায়তা করেছে। ১৯৯২ সালে আদালত এল সালভেদর এবং হন্ডুরাসের মধ্যে ভূমি ও সমুদ্রসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। মহাদেশীয় সোপান ও মৎস্য অঞ্চলকে দু'ভাগকারী সমুদ্রসীমানা নিয়ে ডেনমার্ক ও নরওয়ের মধ্যকার বিরোধও আদালত নিষ্পত্তি করে। সম্প্রতি ১৯৯৩ সালের পূর্বেকার যুগোস্লাভিয়ার দেশগুলোতে গণহত্যাসংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন প্রয়োগের ব্যাপারে আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

নেদারল্যান্ডের দি হেগে আদালত স্থায়ী অধিবেশনে বসে। আদালতের ১৫জন বিচারক সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। একই দেশ থেকে দু'জন বিচারক নির্বাচন করা হয় না। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে নয়জন বিচারককে সে ব্যাপারে একমত হতে হয়।

সচিবালয়

জাতিসংঘ কর্তৃক নিয়োগকৃত সবাই সচিবালয়ের সদস্য। সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে মহাসচিব আন্তর্জাতিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় জাতিসংঘের প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ ও শাখাকে সেবা প্রদান এবং তাদের গৃহীত কর্মসূচি ও নীতিমালা পরিচালনার বন্দোবস্ত করা সচিবালয়ের দায়িত্ব।

সচিবালয়ের সদস্য বিভিন্ন সমস্যার তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রস্তুত করেন যাতে করে সরকারি প্রতিনিধিগণ মূল ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রদান করতে পারেন। সচিবালয় তখন জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা দান করে।

সমগ্র জাতিসংঘ ব্যবস্থা, অর্থাৎ নিউইয়র্কস্থ এর সচিবালয় এবং এর আঞ্চলিক কার্যালয়সহ বিশেষায়িত সংস্থাও কর্মসূচিগুলোর বিশ্বব্যাপী ৫০ হাজারের বেশি লোক কর্মরত আছেন। নিউইয়র্কস্থ সচিবালয়ে

প্রায় ৪ হাজার ৮০০ লোক কাজ করেন। তাদের মধ্যে আছেন অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সম্পাদক, গ্রন্থাগারিক, অনুবাদক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ যাঁরা পর্দার অন্তরালে কাজ করে যাচ্ছেন। সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ যতটা সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে যোগ্য লোক সংগ্রহ করে থাকে। বিধিমাফিক পেশাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ কর্মী নিয়োগ কার্যালয়সমূহ সকল যোগ্য প্রার্থীর তালিকা সংরক্ষণ করে এবং যেকোনো যোগ্য লোক সচিবালয়ে কাজ করার জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

সচিবালয় : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে এই সচিবালয় ভবনটির নকশা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালেস কে হ্যারিসনের নেতৃত্বে একদল বিশ্বখ্যাত স্থপতি।

তথ্যচিত্র :

জাতিসংঘ পতাকা

এটি হলো জাতিসংঘ পতাকা। এতে নীল পটভূমির মাঝখানে আছে সাদা প্রতীক। প্রতীকটি জলপাই শাখায় জড়ানো পৃথিবীর একটি মানচিত্র, যা বিশ্বশান্তির নিদর্শন। জাতিসংঘ পতাকা তৈরি করতে হলে প্রতীকটি হতে হবে পতাকার প্রস্থের অর্ধেক এবং একেবারে কেন্দ্রে। ১৯৪৭ সালের ২০ অক্টোবর সাধারণ পরিষদ পতাকাটির নকশা অনুমোদন করে।

৩

শান্তি ও অগ্রগতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা

১. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ঐ লক্ষ্যে এটি কিভাবে কাজ করে?

জাতিসংঘ একটি বিশ্ব ফোরামের মতো কাজ করে যেখানে রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ ও শান্তিসংক্রান্ত সমস্যাসহ অতি দুরূহ ব্যাপারগুলো উত্থাপন ও আলোচনা করতে পারে। যখন সরকারি নেতৃবৃন্দ পরস্পরের মুখোমুখি হন এবং আলোচনা করে থাকেন তখন তাকে বলে সংলাপ। প্রায়ই জাতিসংঘ বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সুগম করে। মহাসচিব সরাসরি অথবা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে এ ধরনের সংলাপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এ ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে জাতিসংঘ অন্যান্য পন্থা অনুসরণ করে থাকে। সাধারণ পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানাতে পারে অথবা কোনো সন্ত্রাসমূলক কাজের নিন্দা করতে পারে। যখন অনেক দেশ অভিন্ন সুরে কথা বলে, তখন সরকার তা শোনার চাপ অনুভব করে। এগুলো যুদ্ধরত দেশগুলোকে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসে। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানানো থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবরোধ আরোপের পর্যায়ে হতে পারে এবং অবশ্য পালনীয়। সম্ভব হলে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি কার্যক্রম চালাতে পারে এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনায় সহায়তা করতে পারে।

২. জাতিসংঘ কি কোনো যুদ্ধ বন্ধ করেছে?

জাতিসংঘ বহু বিরোধের সূচনা থেকে পূর্ণ আকারে যুদ্ধে পরিণত হওয়া প্রতিরোধ করেছে। এই সংগঠন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনাও চালিয়েছে।

বহু ক্ষেত্রে জাতিসংঘ জরুরি অবস্থা অপসারণে সহায়তার জন্য পথ সৃষ্টি করে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে **বার্লিন সংকট** (১৯৪৮-১৯৪৯),

কম্বোডিয়ার শরণার্থীরা বাড়ি ফিরছেন। কম্বোডিয়ার জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যে ৩,৬০,০০০-এর অধিক শরণার্থীকে স্বদেশে প্রেরণ করা হয়, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যচিত্র : কম্বোডিয়ার পুনর্গঠন

কম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার লোক গৃহত্যাগ করে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ডে প্রবেশ করে। তাদের কিছুসংখ্যক কয়েক বছর যাবৎ জাতিসংঘের তৈরি অস্থায়ী ক্যাম্পে বাস করেন। ১৯৯১ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সমঝোতা অর্জিত হয়, বিরোধের অবসান ঘটে এবং নতুন নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। জাতিসংঘের চ্যালেঞ্জ ছিল বহুবিধ: নির্বাচনের আয়োজন ও তা পরিচালনা করা, সরকারি কার্যালয়সমূহের প্রশাসন, শান্তি বজায় রাখা, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

দু'বছর পর ১৯৯৩ সালের মে মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমানে যুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং শরণার্থীদের অধিকাংশই দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। জাতিসংঘের সহায়তায় কম্বোডিয়ার জনগণ তাদের বিপর্যস্ত জাতির পুনর্গঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কিউবায় **মিসাইল সংকট** (১৯৬২) এবং ১৯৭৩ সালের **মধ্যপ্রাচ্য সংকট**-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলোর প্রতিটির বেলায়ই জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ঠেকাতে সাহায্য করেছে।

জাতিসংঘ ১৯৬৪ সালে **কঙ্গোতে,** ১৯৮৮ সালে **ইরান ও ইরাকের** মধ্যকার যুদ্ধ এবং ১৯৮৯ সালে **আফগানিস্তানের** যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ উত্তরণ সহায়তা দল (UNTAG) **নামিবিয়ায়** প্রথম মুক্ত পরিচ্ছন্ন নির্বাচন তদারক করে, যা দেশটির স্বাধীনতার পথ সুগম করে। **কম্বোডিয়ায়** জাতিসংঘ উত্তরণ কর্তৃপক্ষ (UNTAC) যুদ্ধবিরতি এবং বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহার তদারক ও মনিটর করে এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে এবং আয়োজন করে একটি মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় জাতিসংঘ রক্ষীবাহিনী (UNPROFOR) বেসামরিক এলাকায় নাগরিকদের রক্ষা করা এবং মানবিক সাহায্য সরবরাহ অনুকূল রাখতে কাজ করে।

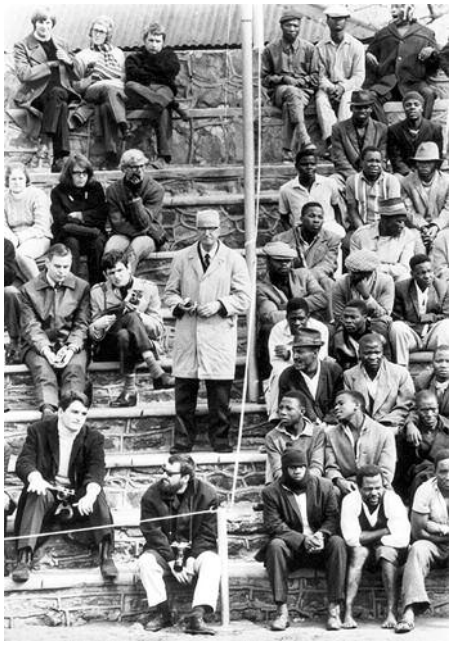

প্রাচীন জাতিবিভেদ আইনের আওতায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লোমফনটেইনে একটি খেলাধুলার গ্যালারিতে বিভক্ত বসার জায়গা। দড়িটি দেশের সাদা এবং কালো জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৩. কোনো দেশ জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে কী ঘটে? জাতিসংঘ কি কখনো তার সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে?

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মান্য করা না হলে এটি তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

প্রথমত বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে উপদেশমূলক মতামতের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত যদি কোনো দেশ শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় বা শান্তি ভঙ্গ করে অথবা আগ্রাসী কাজ করে, তবে সে ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবরোধ আরোপ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিষদ শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়গুলো একেবারে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে রোডেশিয়ার (বর্তমান জিম্বাবুয়ে) সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়। ১৯৭৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তার জাতিগত পৃথকীকরণ নীতির কারণে, যা জাতিবৈষম্য নামে পরিচিত, পরিষদ সামরিক অবরোধ আরোপ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লিবিয়া, সোমালিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইরাক, হাইতি, রুয়ান্ডা, লাইবেরিয়া ও এঙ্গোলার অংশবিশেষের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপিত হয়েছে।

৪. জাতিসংঘের কি কোনো সেনাবাহিনী আছে?

না, জাতিসংঘের কোনো স্থায়ী আন্তর্জাতিক পুলিশ বা সেনাবাহিনী নেই। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী সহায়তা দান এবং সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের দায়দায়িত্ব সংস্থার সদস্যদেশগুলোকে নিতে হয়।

৫. নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘ কিভাবে বিবদমান দলগুলোর মাঝে শান্তি রক্ষা করে?

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে জাতিসংঘ যে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে, তা সদস্যদেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সরবরাহ করে। শান্তিরক্ষাকারীদের যে ভারী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাও সরবরাহ করে সদস্যদেশগুলো। বেসামরিক নাগরিক, সাধারণত যারা জাতিসংঘের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তারাও এ ধরনের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৬. শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কী?

শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করতে জাতিসংঘের অধীনে বহুজাতিক বাহিনীর ব্যবহারকে প্রচলিত অর্থে শান্তিরক্ষা বলা হয়ে থাকে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ যুদ্ধবিরতির সূচনা, তা বজায় রাখতে এবং যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে একটি বিরোধ নিবারক অঞ্চল বা বাফার জোন গঠন সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কূটনৈতিক পর্যায়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের পথ সহজতর করে। শান্তিরক্ষাকারীরা এলাকায় শান্তিরক্ষা নিশ্চিত করে, আর জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারীরা বিবদমান পক্ষ বা দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেন।

দু'ধরনের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম রয়েছে : **পর্যবেক্ষক দল** এবং **শান্তিরক্ষী বাহিনী**।

পর্যবেক্ষকগণ সশস্ত্র থাকেন না। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সেনাদসদ্যরা হালকা অস্ত্র বহন করেন। এগুলো তারা কেবল আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের তাদের দায়িত্ব পালনকালীন পরিধেয় জাতিসংঘের প্রতীক ও নীল শিরস্ত্রাণ দেখে সহজেই শনাক্ত করা যায়। নীল শিরস্ত্রাণ, যা কিনা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের প্রতীক, সব অভিযানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিপদের সময় তা পরিধান করা হয়। শান্তিরক্ষী সেনাসদস্যরা তাদের নিজেদের জাতীয় ইউনিফর্ম পরিধান করেন। যেসব সরকার স্বেচ্ছা সেনাসদস্য প্রেরণ করে, জাতিসংঘের পতাকাধীনে কর্মরত তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর মূল কর্তৃত্ব তাদের হাতেই থাকে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সাধারণত নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে এবং সব সময় মহাসচিব এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাদেরকে অবশ্যই স্বাগতিক দেশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষদের সমর্থন আদায় করতে হয়। সেনাসদস্যদের ও বেসামরিক কর্মীদেরকে একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে হয় এবং যে দেশে তারা অবস্থান করেন সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করেন না।

যখন সংকট দেখা দেয় তখনই শান্তিরক্ষার ব্যাপারটি ঘটে, কিন্তু তার বহু আগে শুরু হয় শান্তি স্থাপনের কাজ। জাতিসংঘ বিভিন্ন উপায়ে নতুন বিরোধ উসকে ওঠা বা বিদ্যমান বিরোধের যুদ্ধে মোড় নেয়া ঠেকাতে চেষ্টা করতে পারে। উপায়গুলো হতে পারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মহাসচিবের সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন অথবা সত্যানুসন্ধানী দল পাঠানো। এ ধরনের কৌশল নিবারক কূটনীতি বা প্রিভেনটিভ ডিপ্লোমেসি নামে পরিচিত।

শান্তিরক্ষা যখন প্রাত্যহিক সেবাযত্নকে বোঝায়।

শান্তিরক্ষা হচ্ছে 'হাসপাতালের স্টাফ যাদের কাজ হলো রোগীর দেহের তাপমাত্রা নামিয়ে রাখা এবং তাদের মোটামুটি সুস্থ রাখা। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে হয়তো একজন বড় সার্জন এসে সমস্যাটা নিজের হাতে তুলে নেবেন।

স্যার ব্রায়ান উরকুহার্ট
সাবেক জাতিসংঘ উপমহাসচিব।

তথ্যচিত্র : অস্ত্রের বদলে অঙ্গ

নিকারাগুয়ার জনগণকে তিক্ত গৃহযুদ্ধের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, যা হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করেছে। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মধ্য আমেরিকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল শান্তিরক্ষী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং বিবদমান দলগুলোর মধ্যে একেকটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে মধ্যস্থতা করেন। এটি হাজার হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে নিরস্ত্র করে এবং তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করে। নিরস্ত্রীকরণ শেষে জাতিসংঘের কাছে পাহাড় সমান অস্ত্রের স্তূপ জমা হয়। এগুলো নিয়ে কী করা যায়? উত্তরটি সোজা। জাতিসংঘ জড়ো করা টন টন অস্ত্র স্থানীয় একটি পুনর্বাসন ক্লিনিকে দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ক্লিনিক এগুলো কৃত্রিম অঙ্গ তৈরিতে কাজে লাগায়। কারা হবে এর সুবিধাভোগী? গৃহযুদ্ধে অঙ্গ হারিয়েছে এমন সব সাধারণ নাগরিক।

এলবা গ্রাসিয়া যুদ্ধে তার একটি হাত হারান। সংগৃহীত অস্ত্র থেকে প্রস্তুত কৃত্রিম হাতের তিনি হলেন অন্যতম প্রথম গ্রাহক। পরে তিনি বলেন, 'আমি না ভেবে পারি না, যে রাইফেল আমাকে আহত করেছে, সেই রাইফেলই আবার আমার জীবন বদলে দিয়েছে, জুগিয়েছে আমার নতুন হাত।'

৭. জাতিসংঘ কেন এত বেশিসংখ্যক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে?

জরুরি সামরিক অথবা মানবিক সংকটের প্রেক্ষিতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। অতীতে শান্তিরক্ষাকারীরা কেবল যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে শান্তিরক্ষার কাজে জড়িত থাকত। কিন্তু এখন অনেক জাতিই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। গৃহবিবাদ এবং জাতিগত দাঙ্গার কারণে কোনো কোনো সরকার নিজস্ব অঞ্চলেই তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে না। এর ফলে মানুষের কষ্টের পরিমাণ বহু গুণে বেড়ে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাতিসংঘকে প্রায়ই একদিকে মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাতে এবং অন্যদিকে বিরোধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য জরুরি ত্রাণ সরবরাহের আহ্বান জানাতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করে জাতিসংঘ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে থাকে।

মধ্য আমেরিকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দলের পালিত দায়িত্বের একটি ছিল নিরস্ত্রকৃত সেনাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অস্ত্র ধ্বংস করা।

উদাহরণস্বরূপ, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার কিছু অংশে বিভিন্ন দল তিক্ত আঞ্চলিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়, হয় আহত আর গৃহহীন। সেই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ রক্ষীবাহিনী (UNPROFOR) গঠন করে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম হিসেবে এটি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তার পাশাপাশি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জনগণের জন্য মানবিক সাহায্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। একইভাবে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত আরেকটি দেশ সোমালিয়ায় জাতিসংঘ সোমালিয়াবিষয়ক কার্যক্রম

(UNOSOM) বিভিন্ন যুদ্ধরত দলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি তদারকি এবং জরুরি ত্রাণ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

৮. ইরাক-কুয়েত অঞ্চলে চালিত 'ডেজার্ট স্টর্ম', কার্যক্রম কি একটি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম?

না, কার্যক্রমটিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা হয় না, যদিও নিরাপত্তা পরিষদ এ ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করে। 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কতকগুলো দেশের সমন্বয়ে চালিত হয়। এটি ১৯৯০-এর নভেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ঐ সিদ্ধান্তে সদস্যদেশগুলোকে কুয়েত থেকে ইরাককে বিতাড়নের জন্য 'প্রয়োজনীয় সব পন্থা' অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালে কোরিয়াতে একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেয়। ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে নিরাপত্তা পরিষদ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ ঠেকানোর উপযোগী সহায়তা দেওয়ার জন্য সদস্যদেশগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করে এবং বলে যে সদস্যদেশগুলো সামরিক এবং অন্যান্য সহায়তা 'যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটি সমন্বিত কর্তৃত্বের' মাধ্যমে সরবরাহ করবে।

১৯৯২ সালে সোমালিয়া, ১৯৯৪-এ রুয়ান্ডায় ও হাইতিতে জটিল সামরিক ও মানবিক সংকট মোকাবেলায় নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যদেশগুলোকে 'প্রয়োজনীয় সব পন্থা' ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সদস্যদেশ শান্তি স্থাপন ও বিপদগ্রস্ত নাগরিকদের রক্ষাকল্পে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দেয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দল ঐ সব প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ক্লাডান্জ-এর একটি শরণার্থী শিশু জাতিসংঘের সরবরাহকৃত জিনিসপত্র নিয়ে তাঁবুর ওপর উড্ডয়নরত জাতিসংঘের একটি হেলিকপ্টারের ছবিতে রঙ করছে। বসনিয়া শহরের তুজলা ও জেনিকার পতনের পর বাস্তুহারা লোকজন, যাদের অধিকাংশই শিশু ও নারী, এই ক্যাম্পে আশ্রয় ও খাদ্য লাভ করে।

তথ্যচিত্র :

পানি... পানি...

পানি এমন একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু যে একে প্রায়ই জীবনের উৎস বলা হয়। দূষিত হলে এই পানিই হয়ে যায় বিপজ্জনক এবং গুরুতর অসুখের কারণ। অনেক দেশেই লোকজনের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা অপ্রতুল। ফলে প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পানিবাহিত রোগে অন্তত ৪ মিলিয়ন শিশু মারা যায়। ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ ২০০০ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু করে। ফলে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ১.৩ বিলিয়ন মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের আওতায় এসেছে। আরো ১.৯ বিলিয়ন লোককে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

৯. শান্তির জন্য জাতিসংঘ আর কী করে?

সাফল্যজনকভাবে শান্তিরক্ষা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমেই জাতিসংঘের শান্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব শেষ নয়। বিরোধ-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ অপসারিত লোকজন এবং শরণার্থীদের তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে। এ ছাড়া জাতিসংঘ মাইন অপসারণ, রাস্তা ও সেতু মেরামত এবং অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও তদারক করে এবং কোনো দেশে নাগরিকদের মানবাধিকারের বিষয়টি কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখা হচ্ছে তাও পর্যবেক্ষণ করে। এই প্রক্রিয়া, যা শান্তি স্থাপন হিসেবে পরিচিত, ৬০টি দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করেছে।

কম্বোডিয়ার সিসোফোন এলাকায় অভ্যন্তরীণ বাস্তুহারাদের জন্য নির্মিত ক্যাম্পে দুটি বালিকা পরিষ্কার পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র হ্রাস উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ অভিযান পরিচালনা করে। কিছু শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে অস্ত্র অপসারণ ও ধ্বংস করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে অনেক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৯ সালে অ্যান্টারটিকা চুক্তিতে অ্যান্টারটিকা অঞ্চলকে অস্ত্র পরীক্ষা বা সামরিক স্থাপনার কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের **জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন** এ ধরনের অস্ত্রের ধ্বংসকে উৎসাহিত করেছে। **রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন** (১৯৯৩) রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিস্তার নিষিদ্ধ করেছে। ব্যাপক **অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি** (১৯৯৬) রাষ্ট্রসমূহের কোনো পারমাণবিক পরীক্ষা বা বিস্ফোরণ পরিচালনা নিষিদ্ধ করেছে।

জাতিসংঘ সহায়তায় নির্মিত শরণার্থী শিবিরে দুই প্রজন্মের দুই ফিলিস্তিনি নারী। গত ৫০ বছরে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী জাতিসংঘের সহায়তা লাভ করেছে।

১০. জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর অর্থ কী?

অনেক দরিদ্র দেশ আছে, যেগুলো বাইরের সাহায্য ছাড়া তাদের জনগণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে অপারগ। জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা নিবারণ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে। মূলত জাতিসংঘ তার সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ শুধু এ খাতেই ব্যয় করে। এর কাজের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

- উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিগুলো চালিয়ে যেতে সামগ্রিক জাতিসংঘ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি বছর ৩০ বিলিয়ন ডলারের অধিক সাহায্য হিসেবে প্রদান করা হয়।
- এটি লাখ লাখ শরণার্থী ও বাস্তুহারা মানুষকে খাদ্য, আশ্রয় এবং জরুরি চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে থাকে।
- এটি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গঠনে সহায়তা করে এবং প্রতি বছর ৩ মিলিয়ন শিশুকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।
- এটি এইডসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেয়।
- এটি রাষ্ট্রসমূহকে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন পন্থা বের করতে সাহায্য করে।

১১. আমাদের পরিবেশ রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা কী? এটি কি পরিবেশ নিয়েও কাজ করে?

জাতিসংঘ আমাদের পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক কার্যক্রমকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতিসংঘ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে, পরিবেশের অবস্থা তদারক ও পর্যবেক্ষণ করে এবং সরকারগুলোকে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পরামর্শ দান করে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যায় এমন সব পরিবেশ বিপর্যয়ের সমাধান করতে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে সরকারসমূহকে একত্র করে। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

- ☐ **বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কনভেনশন** (১৯৭৩) বন্য প্রাণিজ পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- ☐ **মন্ট্রিয়েল প্রটোকল** (১৯৮৭) সরকারসমূহকে ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের নির্গমন কমাতে বাধ্য করে।
- ☐ বিপজ্জনক বর্জ্যপদার্থ পরিবহন সংক্রান্ত **ব্যাসিল কনভেনশন** (১৯৮৯) বিষাক্ত বর্জ্যের খালাস বা বিক্রয় বন্ধ করে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘ রিওডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলনে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আলোচনার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করে। ১০০-এর অধিক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এজেন্ডা ২১ গ্রহণ করেন। এই এজেন্ডাতে আমাদের পরিবেশ রক্ষা এবং সুষম উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক কার্যপরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।

বলিভিয়ার একজন শিক্ষিকা একটি প্রি-স্কুল ডে-কেয়ার সেন্টারে একটি শিশুকে ছবি আঁকায় সাহায্য করছেন। জাতিসংঘ সরকার পরিচালিত সেন্টারটিতে নির্মাণসামগ্রী, রান্নাঘরের তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, খেলনা এবং বই সরবরাহ করেছে।

১২. জাতিসংঘ মানবাধিকারের ব্যাপারে অনেক বক্তব্য প্রদান করে। এর অর্থ কী?

মানবাধিকার সেই সব অধিকার, যা মানুষ হিসেবে আমাদের বাঁচার জন্য আবশ্যক। এই অধিকারগুলোর আওতায় আছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, আইনের চোখে সমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, নিপীড়ন থেকে মুক্তি, চিন্তাভাবনা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, কাজের ও শিক্ষার অধিকার। মানবাধিকার ব্যতীত আমরা নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তুলতে পারি না, পারি না কাজে লাগাতে আমাদের মানবীয় গুণাবলি, বুদ্ধি ও প্রতিভাকে।

১৯৪৮ সালে যখন জাতিসংঘ **সর্বজনীন মানবাধিকার** ঘোষণা করে, তখন এটি সব জাতির জন্য মানবাধিকারের একটি সাধারণ মাপকাঠি স্থির করে দেয়। এই ঘোষণার বলে সরকারসমূহ ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, পুরুষ-নারী, সব জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়।

জাতিসংঘ অন্য অনেক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি সম্পাদন করেছে যার মাধ্যমে জাতিসমূহকে তাদের নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হয়েছে। এই চুক্তিগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি–একটি **অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত** এবং অপরটি **নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার** সম্পর্কিত।

তথ্যচিত্র :

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আফ্রিকার ভাষায় apartheid হলো পৃথকীকরণ। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত জনগোষ্ঠী এটা ব্যবহার করে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা ৮০ ভাগ লোক কালো হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন যাবৎ দেশটি সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের শাসনাধীন ছিল। তারা পৃথকীকরণ নীতি চাপিয়ে দিয়ে দেশটিকে জাতিগতভাবে বিভক্ত করে এবং দেশের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে একেবারে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জাতিসংঘ এই পৃথকীকরণকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে নিন্দা করে এবং তিন দশকের অধিক স্থায়ী অভিযান পরিচালনা করে। জাতিসংঘ দেশের প্রথম মুক্ত ও বহু জাতির অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা দান ও তা তদারক করার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে এই পৃথকীকরণ নীতির অবসান ঘটায়। নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি পৃথকীকরণ নীতির অনুসারীদের শিকার হয়ে বহু বছর কারাগারে কাটান, এক নতুন, জাতিবিদ্বেষহীন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

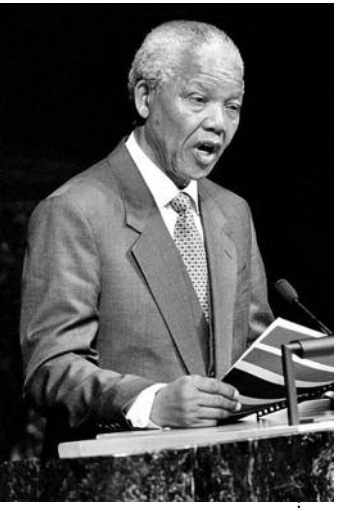

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

এই চুক্তিগুলো দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকলসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল নামে পরিচিত। জাতিসংঘ নারী, শিশু, অক্ষম লোক, সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অসংখ্য চুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছে। এই ধরনের একটি চুক্তি হলো **শিশু অধিকার কনভেনশন,** যা ১৮৫টির অধিক দেশ গ্রহণ করেছে।

১৩. মানবাধিকার রক্ষার আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও তার অবমাননা করা হয়। জাতিসংঘ সে ক্ষেত্রে কী করে থাকে?

জাতিসংঘ কয়েকটি উপায়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর কাজ করে। এটি জাতিসমূহের মানবাধিকারের রেকর্ড মনিটর করতে মধ্যস্থতাকারী দল গঠন করেছে। প্রতিটি দেশে মানবাধিকারের প্রতিবেদন পরীক্ষা করতে জাতিসংঘের বিশেষ কার্যকরী দল রয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে এবং প্রাপ্ত কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। কোনো কোনো দেশে জাতিসংঘ এমনকি নাগরিকদের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে শুনানির জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করতে সহায়তা করেছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার সমস্যাগুলো আলোচনার জন্য **আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও** আয়োজন করে থাকে এবং সরকারসমূহকে মানবাধিকার সমস্যাগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করে।

একজন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সেনাসদস্য ক্রোয়েশিয়ার কিনএ একটি শিশুর সাথে বন্ধুত্ব করছেন।

১৪. জাতিসংঘ আর কী কী ধরনের আন্তর্জাতিক আইন তৈরিতে সহায়তা করেছে?

আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেভাবে পৃথিবীকে ছোট করে এনেছে তাতে রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার পথকে সুগম করতে আরো অধিক আন্তর্জাতিক আইন আবশ্যক। বস্তুত গত বাহাত্তর বছরে জাতিসংঘের আওতায় রাষ্ট্রসমূহ যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে সম্মত হয়েছে, যা সংখ্যায় ৩৫০টির অধিক, মানবজাতির বাকি ইতিহাসে সে পরিমাণ হয়নি। সমুদ্রশাসন বিধি থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বিমান নিরাপত্তা থেকে ডাক বিলি, মহাশূন্য থেকে পরিবেশ– এসব আইনই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

১৫. ঠিক আছে, জাতিসংঘ শান্তি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি খুব কম। এ ধরনের একটি সংগঠন আমাদের কী প্রয়োজন যেটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করতে পারে না?

গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে ১৫০টির মতো যুদ্ধ বেধেছে। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ এ যুদ্ধগুলো ব্যাপক ধ্বংসকারী বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, ছোটখাটো যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং এর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কিন্তু জাতিসংঘের কার্যক্রম নির্ভর করে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ইচ্ছার ওপর, তাদের নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ত্বরিত মানসিকতার ওপর। এসব অভিযান ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তহবিলের অভাবে জাতিসংঘ প্রায়ই অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় না।

১২ বছরের উয়ামবাজিমানা তার মা কাহাবেইকে আলিঙ্গন করছে। জায়ারের (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো) গোমার নিকটস্থ মুগাঙ্গায় নিঃসঙ্গ শিশুদের জন্য জাতিসংঘ সহায়তায় নির্মিত ক্যাম্পে তারা পুনর্মিলিত হয়েছে। রুয়ান্ডায় ১৯৯৪ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে বিরোধ ছড়িয়ে পড়ায় শতসহস্র লোক পালিয়ে যায়। এরাও তাদের সাথে পালিয়ে এসেছে।

কঠোরতম সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে পিছু হটে না যাওয়ার মধ্যেই জাতিসংঘের শক্তি নিহিত। যুদ্ধরত দেশগুলোর মাঝে যুদ্ধ বন্ধের কোনো রাজনৈতিক ইচ্ছা না থাকলে জাতিসংঘ অনেক সময় তার শান্তিরক্ষা বাহিনী সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করে কূটনীতি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরামহীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে শান্তিরক্ষী বাহিনী ফিরে আসতে পারে। প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পৃথিবীর আরো সময় লাগবে। যুদ্ধ, দারিদ্র্য আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ব্যাপারগুলো এখনো ব্যাপক হারে ঘটছে। ঠিক সেজন্যই জাতিসংঘকে কাজ করে যেতে হবে। এর কাজ এখনো শেষ হয়নি। জাতিসংঘ যদি না থাকত, বিশ্বের দেশগুলোকে আরেকটি সংগঠন সৃষ্টি করতে হতো; হয়তো সংগঠনের নাম হতো অন্য কিছু, কিন্তু এর কাজ হতো ঠিক জাতিসংঘের কাজের মতোই।

তথ্যচিত্র : শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান

১৯৯৫ সালে ৫৩ মিলিয়নের বেশি লোককে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ১১৫ জনে একজনকে শরণার্থী বা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুহারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গৃহযুদ্ধ এবং জাতিগত বিদ্বেষের ফলে তারা হয় নিজ দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করতে অথবা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। ঘটনা যা-ই হোক, এই লোকগুলোর, যাদের অধিকাংশই শিশু এবং নারী, বাড়ি বলতে কোনো জায়গা নেই। তাদের অনেকের জন্য জাতিসংঘই সর্বশেষ আশ্রয়। জাতিসংঘ তাদের খাদ্য, জরুরি চিকিৎসা সহায়তা এবং নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে। অনেক সময় এটি বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে যাতে শরণার্থীরা ক্যাম্পের বাইরে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হয়।

মরক্কোর তাজা প্রদেশের তাজা গ্রামের মউলে আল-হাসান প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি বালিকা মনোযোগসহকারে তার পাঠ শ্রবণ করছে।

বাংলাদেশের ঢাকাস্থ একটি ত্রাণকেন্দ্র। এই ক্যাম্পে পরিবেশিত খাদ্য জাতিসংঘ সরবরাহ করে।

বাস্তব চিত্র : বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো

পৃথিবীর সব জায়গাতেই বালিকারা বৈষম্যের শিকার হয়। তারা প্রায়ই বালকদের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে এবং অনেক দেশেই এমনকি ৫-৬ বছর বয়সেই দীর্ঘ সময় কাজ করে। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী ৮০ মিলিয়ন বালিকা বিদ্যালয়ে যায় না। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন (১৯৮৯) নামে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাতে সরকারগুলোকে বালিকাদের শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয়ের অনুরোধ জানানো হয়। এই ভূমিকার জন্য জাতিসংঘকে ধন্যবাদ। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শতকরা ৭৭ ভাগ ছেলেমেয়েই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ১৯৬০ সালে এর হার ছিল শতকরা ৫০ ভাগের নিচে। সেই তুলনায় এ এক বিরাট সাফল্য। এটাই অগ্রগতি কিন্তু এখনো অনেক কিছু করতে হবে।

তথ্যচিত্র : দুর্যোগ মোকাবেলা

১৯৯০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঝড়ে ৫ লক্ষাধিক লোক নিহত ও আহত হয়। শতসহস্র লোকের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। জাতিসংঘই প্রথম উপদ্রুত অঞ্চলে জরুরি ত্রাণসহায়তা প্রেরণ করে। সংস্থাটি ওষুধ, টিনজাত খাবার, কম্বল ও তাঁবু পাঠায়। তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য জরুরি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়। পরে জাতিসংঘ সাহায্যের জন্য বিশ্বব্যাপী আবেদন করে। জাতিসংঘের সাথে একত্রে কাজ করে বাংলাদেশের লোকজন ধীরে ধীরে তাদের বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ করে। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় ঘটতে পারে। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে যত দ্রুত সম্ভব দুর্যোগ আক্রান্ত দেশে সর্বাধিক জরুরি ত্রাণসাহায্য সরবরাহ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপদ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ১৯৯০-এর দশককে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস দশক হিসেবে ঘোষণা করে।

তথ্যচিত্র : গুটিবসন্ত... যাচ্ছে... যাচ্ছে... গেল

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের ছেলেমেয়েরা হাম, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ এবং পোলিও–এই ছয়টি সবচেয়ে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। UNICEF এবং WHO-এর প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ ছেলেমেয়েকে রোগ প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর ৩ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। গুটিবসন্তের মতো আরেকটি মারাত্মক রোগ এখন সারা পৃথিবী থেকে বিদূরিত হয়েছে। পোলিও পশ্চিম গোলার্ধ থেকে দূরীভূত হয়েছে।

কঙ্গোর কিনটামো লিওপল্ডভিল এলাকার একটি হাসপাতালে একজন চিকিৎসা সহযোগী নারী ও শিশুদের টিকা দিচ্ছেন।

তথ্যচিত্র : অবশেষে মুক্ত

১৯৪৫ সালে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ স্বদেশেই বিদেশি শাসনে বাস করত। উপনিবেশ হিসেবে পরিচিত এসব দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পর্তুগালসহ গুটি কয়েক বৃহৎ শক্তির মাঝে ভাগ করা ছিল। উপনিবেশ উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ অধিকাংশ উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে। ৮০টির অধিক সাবেক উপনিবেশ এখন নিজেরাই জাতিসংঘের সদস্য।

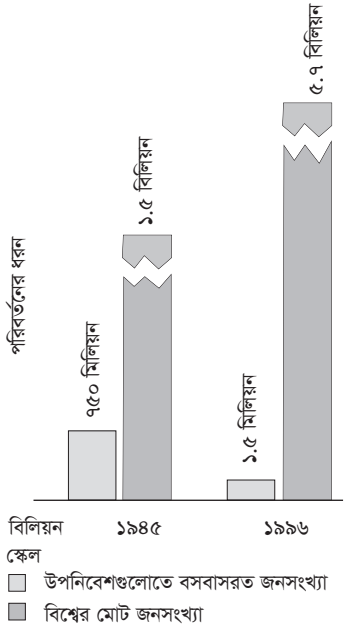

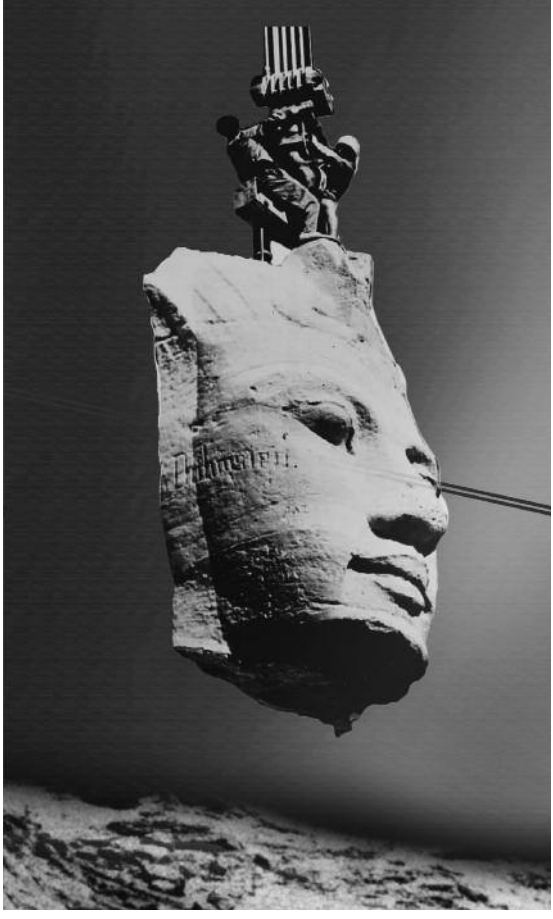

নুবিয়া মন্দিরের অংশবিশেষ স্থানান্তর করা হচ্ছে।

তথ্যচিত্র : নুবিয়া মন্দির রক্ষাকরণ

মিসরে নুবিয়ার মতো বহু প্রাচীন মন্দির এবং সমাধিস্তম্ভ রয়েছে। নীল নদে আসওয়ান বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫ হাজার বছরের পুরনো এসব সমাধি মন্দিরের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালে UNESCO এসব ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সূচনা করে। এদেরকে প্লাবিত অঞ্চল থেকে সরিয়ে উঁচু কোনো স্থানে নিয়ে গেলেই কেবল তা হতে পারত। জাতিসংঘের আনীত বিশেষজ্ঞরা ঠিক এটাই করেছে; তারা সমাধি মন্দিরগুলো ব্লক করে কেটে অধিকতর নিরাপদ স্থানে পুনঃসংযোজন করেছে। এই চমৎকার কাজটি করতে তাদের ২০ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। UNESCO এ যাবৎ ৮০টির বেশি দেশে এ ধরনের বহু ঐতিহাসিক সমাধি মন্দির রক্ষায় সহায়তা করেছে। এর মধ্যে আছে গ্রিসের এথেন্স নগরীর এক্রোপোলিস, কম্বোডিয়ার অ্যাংকর ওয়াট মন্দির, অস্ট্রেলিয়ার উলুরু কাটা টিউটা জাতীয় উদ্যান, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভায় অবস্থিত বড়বুদুর মন্দির।

১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে প্রদত্ত নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক।

তথ্যচিত্র : শান্তিরক্ষার পুরস্কার

'বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে তারা, তাদের প্রেক্ষাপটেও ভিন্নতা বিস্তর, কিন্তু একটি বিষয়ে তারা একমত হয়েছে: ঝুঁকি জেনেও তারা তাদের যৌবন ও শক্তিকে সেবার কাজে নিয়োজিত করতে আগ্রহী হয়েছে। মানুষের পক্ষে সম্ভব সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য দেওয়ার ভাগ্য তারা বরণ করেছে।'

এই বক্তব্য রেখে নরওয়ের নোবেল কমিটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে ১৯৮৮ সালের শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো জাতিসংঘ বা তার সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করল। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর নীল শিরস্ত্রাণ পরে ১৭ জন সেনাসদস্য অন্য হাজার হাজার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী সদস্যের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বারো বছর বয়সী ডেমিঙ্গো, এঙ্গোলার কুইটো এলাকার ক্যাম্প মিনাসের তাঁবুর সম্মুখে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি স্থলমাইন দুর্ঘটনায় সে তার একটি পা হারায়

তথ্যচিত্র : বধ্যভূমি

স্থলমাইন একটি মারাত্মক বিস্ফোরক। পৃথিবীব্যাপী ৬৮টি দেশে এগুলো মাটির নিচে স্থাপন করা রয়েছে। প্রতি মাসে এগুলোর কারণে ২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত বা আহত হয়। শুধু কম্বোডিয়াতেই এখনো ৬ থেকে ১০ মিলিয়ন স্থলমাইল পোঁতা আছে, যার ফলে প্রতিদিন ১০ জন মানুষ হতাহত হচ্ছে। জাতিসংঘ এই মারাত্মক মাইনগুলোকে অপসারণে রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করছে।

মাইন খুঁজে বের করা ও ধ্বংস করা বেশ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। প্রতি বর্গমিটার ভূমি চিহ্নিত করে সাবধানে পরীক্ষা করতে হয়। হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে ১১০ মিলিয়ন স্থলমাইন পোঁতা আছে, তার সবগুলোকে অপসারণ করতে হলে খরচ পড়বে ৩৩ বিলিয়ন ডলার এবং সময় লাগবে ১,১০০ বছর। জাতিসংঘ স্থলমাইনের সব নতুন উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছে।

৪

বারবার আসে এমন কিছু প্রশ্ন

১. কে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে?

স্বাধীন সব দেশ, যেগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে কেবল তারাই জাতিসংঘের সদস্য হতে পারবে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী, যেসব শান্তিকামী দেশ তাদের আইনগত দায়দায়িত্ব মেনে নিয়েছে এবং সেগুলো পালনে সমর্থ ও ইচ্ছুক, তারা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের যোগ্য। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন কোনো রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

২. ভেটো কী?

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বের পাঁচটি বড় শক্তি মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। এই বড় শক্তিগুলোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে। জাতিসংঘ সনদপ্রণেতারা ঠিক করেছিলেন যে, এই পাঁচটি বড় শক্তি–চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ফেডারেশন (সাবেক (USSR), যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র–আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে। এই পাঁচটি শক্তিকে বিশেষত যুদ্ধ ও শান্তি প্রশ্নে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একত্রে কাজ করানোই ছিল শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের সর্বোত্তম পন্থা। সে সুবাদে এই মর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কার্যবিবরণী বহির্ভূত কোনো বিষয়ে যদি এই **'বৃহৎ পাঁচের'** কোনো একটি **'না-বোধক ভোট'** প্রদান করে, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ তার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। স্থায়ী সদস্যদেরকে দেয় এই বিশেষ ক্ষমতা 'ভেটো অধিকার' নামে পরিচিত।

কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন–এজেন্ডা তৈরি, পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে আমন্ত্রণ অথবা কার্যপ্রণালী বিধি তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ জন সদস্যের যেকোনো নয়জনের 'হ্যাঁ'-বোধক ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা নেই।

৩. মাত্র পাঁচটি বড় শক্তির ভেটো প্রদানের অধিকার আছে, এটা কি ঠিক?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক দেশ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ও বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে। অবশ্য এ কাজটি কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য হয়নি। কিছু সদস্য দেশ ভেটো প্রদানের অধিকার বিলোপ ধারণার বিরোধিতা করে। অন্যরা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ এ ধরনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এই অধিকার সীমিতকরণের পক্ষে মত দেয়। যেকোনো পরিবর্তনসাধনের আগে জাতিসংঘ সনদ সংস্কার করা আবশ্যক।

১৯৯৪ সালে জানুয়ারি থেকে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত একটি কর্মী দল নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ বৃদ্ধির প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করছে। কিছু দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা থেকে একটি করে দেশ স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। অবশ্য এই প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে এখনো কোনো ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৪. জাতিসংঘ দিবস কী?

সহজভাবে বলতে গেলে এটি জাতিসংঘের জন্মদিবস। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ মেনে নিয়ে এর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করে। জন্ম হয় জাতিসংঘের। এজন্য ২৪ অক্টোবর দিনটিকে সারা বিশ্বে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

৫. জাতিসংঘ অন্য কী কী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করে?

প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে পালন করা হতো। এই দিবস এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের প্রারম্ভিক দিবস একই ছিল। তবে বর্তমানে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে।

জাতিসংঘের অন্যান্য উদযাপনীয় দিবস হলো :

- ☐ আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)
- ☐ বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন)
- ☐ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস (১৭ অক্টোবর)

স্পেনের সঙ্গীতজ্ঞ পাবলো ক্যাসালস। ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে তাঁর Hymn to the United Nations শীর্ষক সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

- ☐ বিশ্ব এইডস দিবস (পহেলা ডিসেম্বর)
- ☐ মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর)

৬. জাতিসংঘের কি কোনো আনুষ্ঠানিক (অফিশিয়াল) সঙ্গীত আছে?

জাতিসংঘের কোনো আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত নেই। সাধারণ পরিষদ এ ধরনের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং এই ধরনের একটি গান বাছাই ও অনুমোদনের অধিকার এই পরিষদের রয়েছে। এ সম্পর্কে আর কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

১৯৭০ সালে স্পেনের সঙ্গীতজ্ঞ পাবলো ক্যাসালস্ জাতিসংঘের সম্মানে ইংরেজ কবি ডব্লিউ এইচ অডেন রচিত একটি সঙ্গীতে সুরারোপ করেন। এই সঙ্গীতটি ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ দিবসে পরিবেশন করা হয়।

জাতিসংঘ দিবস পালনের জন্য কী করা যেতে পারে?

জাতিসমূহের মাঝে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করে জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয়। পৃথিবীকে অধিকতর ভালোভাবে গড়ার কাজে সম্মুখস্থ অবিরাম চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটিই এই দিবসের ভাবনা। যেহেতু এই ব্যাপারটিতে আমরা সবাই জড়িত, কাজেই প্রত্যেকেরই জাতিসংঘ দিবস পালনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

জাতিসংঘ দিবস বিভিন্নভাবে উদযাপন করা যায়। এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো

বিদ্যালয় : বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে সভার আয়োজন করার মাধ্যমে তোমরা জাতিসংঘ দিবস পালনের আয়োজন করতে পারো। তোমার বিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী থাকে, তবে তারা তাদের জাতীয়

পোশাক পরিধান করতে পারে, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে বা তাদের দেশের প্রচলিত গল্প শোনাতে পারে।

তোমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকার আলোকে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারো, বিষয়বস্তু হতে পারে শান্তিরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার। তোমাদের পছন্দনীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করার জন্য একজন অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারো। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দেশের পতাকা প্রস্তুত করতে পারে এবং গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সংস্কৃতির পুস্তকাদি প্রদর্শিত হতে পারে। তোমরা তোমাদের শ্রেণিকক্ষের দেয়াল পত্রিকা বা বিদ্যালয়-ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারো।

তোমাদের যদি ভিডিও সুযোগ-সুবিধা থাকে, তাহলে তোমাদের শিক্ষককে স্থানীয় ভিডিও লাইব্রেরি থেকে অথবা নিকটস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র থেকে কোনো প্রামাণ্যচিত্র ধার করে আনার অনুরোধ করতে পারো। ব্যক্তিগতভাবে তুমি জাতিসংঘকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় চিঠি লিখতে পারো।

তোমার সমর্থন জানাতে তুমি স্থানীয়, জাতিসংঘ সংগঠনে যোগদানের ব্যাপারটি বিবেচনা করতে পারো। তুমি তোমার সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে একটি মডেল জাতিসংঘ কর্মসূচির আয়োজনও করতে পারো।

মহল্লায় : জাতিসংঘ দিবস উদযাপনের জন্য কিছু গতানুগতিক অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা যায়, যেমন–পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, সম্মেলন ও সেমিনার, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব, চিত্র ও শিল্প মেলা, পুস্তক বিক্রয়, খাবার বিক্রয় ইত্যাদি।

তোমাদের স্থানীয় সরকার এই উৎসব উদযাপনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে একটি জাতিসংঘ দিবস ঘোষণা প্রদানে উৎসাহিত হতে পারে। বেসরকারি সংগঠনগুলো শান্তি ও মানবাধিকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতিসংঘ দিবস পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে।

বহু দেশ বৃক্ষরোপণ, দরিদ্রদের জন্য বই এবং পোশাক সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতিসংঘ দিবস পালন করে থাকে। অনেক সময় সরকারসমূহ জাতিসংঘের নামে কোনো রাস্তা বা পার্কের নামকরণ করে এবং জাতিসংঘ দিবস স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ অথবা মুদ্রা ছেড়ে দিবসটি পালন করে থাকে।

প্রতিদিন জাতিসংঘে সারা বিশ্বের মানুষের কাছ থেকে প্রচুর চিঠি আসে। এগুলোর অনেকই জাতিসংঘের কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেখা তরুণ-তরুণীদের চিঠি। অন্যান্য মহাসচিব কিভাবে তাঁর কাজ সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারেন সে ব্যাপারে পরামর্শ জানিয়ে লেখা। ১৯৯৬-এর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস উদযাপনের জন্য গণতথ্য বিভাগ সাধারণ পরিষদে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উপলক্ষে তরুণ-তরুণীদের পাঠানো চিঠির বাছাইকৃত কতগুলো পড়ে শোনানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো এক তরুণ সমর্থকের পাঠানো এই চিঠিটি সেগুলোর একটি।

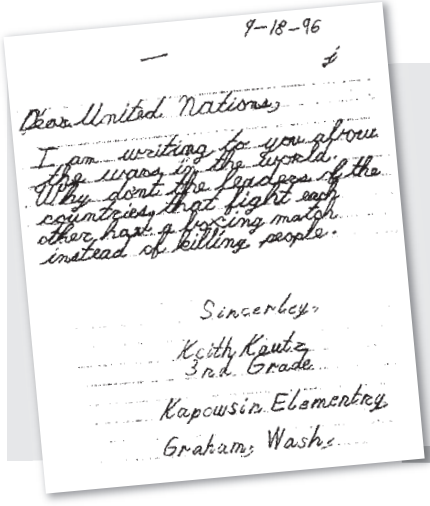
9-18-96

Dear United Nations,

I am writing to you about the wars in the world. Why don't the leaders of the countries that fight each other have a boxing match instead of killing people.

Sincerely,
Keith Kautz
3rd Grade
Kapowsin Elementary
Graham, Wash.

প্রিয় জাতিসংঘ,
আমি তোমাকে পৃথিবীর যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখছি। পৃথিবীর নেতারা কেন মানুষ হত্যার পরিবর্তে একটা মুষ্টিযুদ্ধ খেলার আয়োজন করে না?

তোমার বিশ্বস্ত

কিথ কোজ
তৃতীয় গ্রেড
কাপোসিন এলিমেন্টারি স্কুল
গ্রাহাম, ওয়াশিংটন

৭. জাতিসংঘ সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্য আমি কোথায় লিখব?

জাতিসংঘ পৃথিবীর একটি অন্যতম নেতৃস্থানীয় তথ্য সরবরাহকারী সংগঠন। এটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশনা, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক জরিপ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরিসংখ্যান থেকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি থেকে পরিবেশ, বিজ্ঞান থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, কৌতূহলের সব বিষয়ই জাতিসংঘ এর বিশেষায়িত সংস্থা ও কর্মসূচিগুলোর আওতাধীন। এই সংগঠন চলচ্চিত্র, ভিডিওচিত্র এবং বেতার অনুষ্ঠানাদিও নির্মাণ ও আয়োজন করে থাকে।

জাতিসংঘ তথ্য সামগ্রী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
Phone: 9183086, Fax: 9183106, E-mail: info.unic@undp.org

৮. জাতিসংঘ-সংক্রান্ত তথ্য কি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়?

হ্যাঁ, বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে জাতিসংঘের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার আছে। এই তথ্যভাণ্ডার পাঁচটি বিষয়-সংক্রান্ত তথ্য ধারণ করে; শান্তি ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ও মানবিক বিষয়সমূহ। এক সারি দ্রুত-প্রবেশ সূচক ব্যবহার করে ব্যবহারকারী জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, খবরাখবর, দলিলাদি এবং শ্রুতি-দর্শন সেবাসহ বহু বিষয়ের ওপর বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন। অধিকন্তু, বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের একটি স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক মানচিত্রের মাধ্যমে জাতিসংঘ কার্যালয় এবং জেনেভা, প্যারিস, ভিয়েনা ও টোকিওসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করা যায়। জাতিসংঘের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডারের ওয়েবসাইট হলো : <http://www.un.org>

৯. তরুণদের জন্য জাতিসংঘের নেটওয়ার্কে বিশেষ কিছু সংযোজিত আছে কি না?

হ্যাঁ, দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ সাইবার স্কুলবাস নামক একটি শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান চালু আছে। এতে নতুন নতুন ধারণা, পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য এবং শ্রেণিকক্ষের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান সংযোজিত হয়েছে। এর চালু ডাটাবেস এর মাধ্যমে ১৯৩টি সদস্যদেশ সম্বন্ধে ৩০টি তথ্য ক্ষেত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এর অত্যাধুনিক বিশ্ব চিত্রশালায় সারা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত চিত্র স্থান পেয়েছে। সাইবার স্কুলবাসে প্রবেশের ওয়েবসাইট হলো : http://www.un.org/pubs/CyberSchoolBus। এই নেটওয়ার্কে নমুনা জাতিসংঘ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলোচনা বিভাগ রাখা হয়েছে। নমুনা জাতিসংঘ আলোচনা বিভাগ MUNDA তরুণদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিন্তাধারা বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে। (MUNDA)তে প্রবেশের ওয়েবসাইট হলো : <http://www.un.org/publs/CyberSchoolBus/munda>

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

UNIC

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ